Vol. 60 | No. 3 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য

Volume	60
Issue	3
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Abdus Sobhan Talukder
Published online	November 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i3.3
Pages	43-56
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.3
প্রবন্ধ জমাদান: ১ অক্টোবর ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৪৩-৫৬

বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: upaltalukder501@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আধুনিকতাবাদীদের বিশ্বাসের, চিন্তাশীলতার ও জীবনানুভবের রূপায়ণ আধুনিক কবিতা। তেমনই, উত্তরাধুনিক কবিতাও উত্তরাধুনিক উপলব্ধির শিল্পরূপায়ণ। 'আধুনিকতা' এবং 'উত্তরাধুনিকতা'—দুটিই পশ্চিমা চিন্তাশীলতা, যার অনিবার্য প্রভাব বাংলা কবিতাতেও লক্ষযোগ্য। 'আধুনিক' ধারণাটিতে মানবকেন্দ্রিকতার ও যুক্তিশীলতার (rationality) কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আধুনিক মানুষের সেই বিশ্বাস ও চিন্তার জগৎ প্রবলভাবে ধসে পড়ে। এই পটভূমিতে আধুনিকতাবাদবিরোধী প্রতিচিন্তাশীলতা হিসেবে উত্তরাধুনিকতাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। উত্তরাধুনিকেরা আধুনিক চিন্তাশীলতাকে খারিজ করে দিতে চান। মহাবয়ান (matanaratives) হিসেবে পরিচিত আধুনিকতাবাদীদের পরিত্যক্ত চিন্তাশীলতাকে প্রতিচিন্তা (reverse thinking) ধারা খণ্ডন ও খারিজ করেই উত্তরাধুনিকতাবাদীদের পথচলা। বাংলাদেশের বিশেষ একটি কালখণ্ডে (২০০০-২০২৪) রচিত উত্তরাধুনিক কবিতার বিষয়-আশয় কী এবং কীভাবে সেগুলো বিস্তৃত হয়েছে, এই প্রবন্ধে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

উত্তরাধুনিক কবিতা, উত্তরাধুনিকতাবাদী তত্ত্ব, মহাবয়ান, পুনর্নির্মাণ, ছদ্মায়ন, অভিবাস্তবতা, খণ্ডন, বহুত্ববাদ, যুক্তিশীলতা।

উত্তরাধুনিকতাবাদ শব্দটি আধুনিকতাবাদ শব্দের বিপ্রতীপ হিসেবে অবলম্বিত। এটি আধুনিকতাবাদবিরোধী একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম। উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রবক্তা হিসেবে অনেকের নামই উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে তাঁদের ভেতরে ফ্রেডরিখ নিৎশে (১৮৪৪-১৯০০), জ্যাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪), মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জাঁ লিওতার (১৯২৪-১৯৯৮), জাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১), জিন বদ্রিয়ার (১৯২৯-২০০৭)—এঁদের নাম সামনে চলে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপে এবং ল্যাটিন আমেরিকায় উত্তরাধুনিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। শুরুর দিকে স্থাপত্যকলায়, ভাস্কর্যশিল্পে এবং চিত্রকলায় এর প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পরপরই ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশসহ আরো কিছু ভাষার সাহিত্যকর্মে উত্তরাধুনিক ভাবাদর্শ ছাপ ফেলতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে—আরো স্পষ্ট করে বললে, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায় উত্তরাধুনিক চিন্তাশীলতার প্রভাব পড়তে দেখি বিশ শতকের সত্তর দশকে। বাংলাদেশের কবিতায় এই প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে। বিশ শতকের সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায় উত্তরাধুনিক চিন্তাশীলতার ছাপ পরিস্ফুট হতে প্রথম দেখা যায়। রণজিৎ দাশ (জ. ১৯৪৯), মৃদুল দাশগুপ্ত (জ. ১৯৫৫) এবং জয় গোস্বামী (জ. ১৯৫৪) এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের কবিতায় উত্তরাধুনিক বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হতে শুরু করে আরো দুই দশক পরে—নব্বইয়ের দশক থেকে। বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক সক্রিয়তা সংঘটিত হয়েছে প্রধানত কিছু পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগ ও বুলেটিনকে আশ্রয় করে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত *উত্তরাধুনিকতা*, *দ্রাবিড়*, *সকাল*; বগুড়া থেকে প্রকাশিত *নিসর্গ*, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *লিরিক*, কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *ঘোড়াউত্রা* ইত্যাদি পত্রিকা বাংলাদেশে উত্তরাধুনিক কবিতা-আন্দোলনে পালন করেছে পথিকৃতের ভূমিকা।

উত্তরাধুনিকতাবাদী তত্ত্ব ও মতবাদ হিসেবে লেখকের মৃত্যু, মহাবয়ান (matanarative), পুনর্নির্মাণ, ছদ্মায়ন (simulation), অভিবাস্তবতা (hyperreality), খণ্ডন, বহুত্ববাদ বিশিষ্ট হলেও বর্তমান প্রবন্ধে যেহেতু বাংলাদেশের বিশেষ একটি কালখণ্ডে (২০০০-২০২৪) রচিত উত্তরাধুনিক কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য কেবল আমার আলোচ্য, তাই সংশ্লিষ্ট তত্ত্বসমূহের রূপায়ণ বিশ্লেষণকালে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রপরিধির মধ্যেই আমি নিবদ্ধ থাকব।

'আধুনিক' ধারণাটির ভেতরে যুক্তিশীলতার একটি জোর ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 'আধুনিক' মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তাজগৎ বিপুলভাবে ধসে পড়ে। 'আধুনিক' মানুষ মনে করত, পৃথিবীর সকল কর্মকাণ্ডের অন্তরালে নির্দিষ্ট একটি যুক্তি আছে। মানুষ খুব যুক্তিশীল প্রাণী। মানুষ দিনে দিনে আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে, আলোকিত হচ্ছে; মহাবিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, তার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবকল্যাণ—এটিই ছিল 'আধুনিকতা'র কেন্দ্রীয় ধারণা। উল্লেখ করা দরকার, এই 'আধুনিক' মানুষ হচ্ছে পশ্চিমা আধুনিক মানুষ। উত্তরাধুনিক বোধ আধুনিক মানুষের এই বোধকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গুঁড়িয়ে যাওয়া আধুনিক মানুষের এই বিশ্বাসের জগৎ উত্তরাধুনিকতাবাদী পরিভাষায় মহাবয়ান (matanaratives) বা বানোয়াট গালগল্পসমগ্র। উত্তরাধুনিক তত্ত্বগুলোর ভেতরে ম্যাটান্যারেটিভস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত। জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতার এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। মামুন অর রশীদ (২০১৯: ৪০-৪১) ম্যাটান্যারেটিভস সম্পর্কে বলেন:

> মেটান্যারেটিভস হলো উত্তর-আধুনিক তত্ত্বগুচ্ছের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। ... মেটান্যারেটিভ বা মহা আখ্যান হলো আধুনিকতাবাদীদের অতিরঞ্জিত পবিত্র গল্প। অর্থাৎ আধুনিকতাবাদীরা জ্ঞানজগতে কিছু ধারণার প্রচলন ঘটিয়েছেন, উত্তর-আধুনিকরা যাকে গালগল্প বলতে চান। ... উত্তর-আধুনিকতা আধুনিকতার ধারণাগুলো পরিত্যাগ করেছে এবং এই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে, কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত জ্ঞান নির্ভুল-পবিত্র নয় ...।

এসব ম্যাটান্যারেটিভসের উপরে পশ্চিমা জগৎ তিনশ বছর টিকে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানুষ প্রথম বুঝতে পারে, আপাতভাবে প্রতিষ্ঠিত এই ধারণাগুলো—কেন্দ্রীয় মানবিকতার ধারণা, যৌক্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথিবীর ধারণা, মানুষের 'উদার', 'মহৎ' বলে কথিত জীবনভাবনা, প্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ সামগ্রিক বিশ্বজগতের প্রতি মানুষের কল্যাণমূলক চিন্তাধারা—অসার ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বযুদ্ধ 'আধুনিক' মানুষের বোধগুলো সব খারিজ করে দিয়েছে। উত্তরাধুনিকেরা কোনো তত্ত্ব, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, বিশ্বাসকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে রাজি নন। আপাতভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্যকেও তাঁরা বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে নারাজ। যে সব দর্শন শত শত বছর ধরে আধুনিক মানুষের মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, উত্তরাধুনিকতাবাদীরা সে সব দর্শনকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রতিদর্শন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্রতী।

'খণ্ডন' উত্তরাধুনিক কবিতার একটি অনিবার্য প্রবণতা, যার মাধ্যমে আধুনিকদের মহাবয়ানের অলীকতা, অসারতাকে উন্মোচন করা হয়। উত্তরাধুনিক কবিরা 'আধুনিক' কবিদের মতো উচ্চমার্গীয় কোনো থিম, সূত্রবদ্ধ কোনো প্রকার মহৎ বার্তা দিতে চান না, কারণ তথাকথিত উচ্চমার্গীয় কোনো থিমে তাঁরা আস্থাশীল নন। আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় যেসব জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, তত্ত্ব, দর্শন, সত্য, সুন্দর, কল্যাণের কথা আপ্তবাক্যের মতো আওড়াতেন, উত্তরাধুনিক কবিরা সেগুলোকে বিনা প্রশ্নে প্রণিধানযোগ্য বলে আর বিবেচনা করছেন না। এই অর্থে, উত্তরাধুনিক কবিতা সংক্ষুব্ধ, সংশয়দীর্ণ, আধুনিকতর মানুষের বিপন্ন অনুভবের বিশিষ্ট রূপায়ণ বলা যায়।

উত্তরাধুনিকতার তত্ত্বগুলোর ভেতরে বহুত্ববাদ একটি। এই তত্ত্বটিকে আমি জনতাবাদ বলতে চাই। মত, মতাদর্শ, চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে বহুত্ববাদে বা জনতাবাদে একক ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই চিন্তাশীলতাটি উত্তরাধুনিক চিন্তাশীলতা কি না, তা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার সংশয় আছে।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত মতবাদসমূহের কালিক পরম্পরা বা কালানুক্রমিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মতামতগুলো প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত সাম্প্রতিকীকরণ করা হয়েছে। আরো অগ্রগামী চিন্তাশীলতাকে গ্রহণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে—কখনোই মানব-চিন্তাশীলতার যাত্রাপ্রবাহ বিপরীতমুখী হয়নি। উত্তরাধুনিক শব্দটির ভেতরেই রয়েছে অব্যাহত অগ্রযাত্রার একটি চলিষ্ণু ধারণা, আধুনিক-পরবর্তী ক্রমশ অগ্রগামী কালিক চিন্তাশীলতার একটি ব্যঞ্জনা। ব্যক্তিকতা তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর ভিত্তি করে আধুনিকতার যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত, সেই ধারণাটির সাথে শুধু বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা করার জন্য উত্তরাধুনিকতার ধারণায় ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে বহুত্ববাদী ধারণার এই রকম মিশেলীকরণ প্রশ্নবিদ্ধ।

তবে এটি স্বীকার্য যে, আধুনিক কবিতার স্থানীয়করণ যেখানে সীমিত ছিল কেবল কেন্দ্রে, উত্তরাধুনিক কবিতায় সেখানে পরিধিবিস্তার ঘটেছে প্রান্তেও। কবিতার শিল্পসমৃদ্ধির জন্য একইসঙ্গে কেন্দ্রের ও প্রান্তের এই সমন্বয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়। কবিতায় কেন্দ্র ও প্রান্ত সমন্বিত না হলে কবিতা অনিবার্যভাবেই খণ্ডিত হয়ে পড়ে কেন্দ্রের অভিজাত-কথনে, নতুবা প্রান্তিক ব্রাত্যবয়ানের পরিসীমার ভেতরে। কেন্দ্র ও প্রান্তের এই যোগসূত্রের ফলে উত্তরাধুনিক কবিতা-ভাষায় প্রচলিত প্রমিত শব্দের সঙ্গে প্রবল প্রতাপে একীভূত হয়েছে আঞ্চলিক শব্দ, বিদেশি শব্দ, এমনকি অসংখ্য ট্যাবু শব্দও। নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে যে উত্তরাধুনিক কবিতার স্ফুট-অস্ফুট ছাপ পরিলক্ষিত হতে শুরু করে, একুশ শতকের প্রথম দুই দশকেরও বেশি কালখণ্ডে (২০০০-২০২৪) তা আরো স্পষ্ট ও পরিণত। 'আধুনিক' কবিতার তথাকথিত পুরানো, পরিত্যক্ত পদচ্ছাপ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিদের নতুন নতুন পথনির্মাণে প্রয়াসী হতে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতায় আধুনিকতাবাদীদের কথিত মহাবয়ানগুলো কীভাবে খণ্ডন করা হয়েছে, তা এবার অনুসন্ধান করা হবে। বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতা যদিও বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই মহাবয়ানকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে, তবে মহাবয়ানের প্রধান ভিত্তিগুলোতে এই আঘাত অধিক সুস্পষ্ট। নিচে ধারাবাহিকভাবে সে ক্ষেত্রগুলোতে আলোকপাত করতে চাই।

এক

মানুষের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব, মানবকেন্দ্রিক চিন্তাশীলতাকে নিয়ে বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতায় যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখি, তা গুরুতর। যেমন:

১. এই পৃথিবী যতটা মানুষের, ততটা টিকটিকির।
(ইমতিয়াজ ২০২০: ১৩)

২. 'মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব'—এ রকম একটা ধারণা জারি আছে।
আমি এই ধারণাটাকে
অস্বীকার করতে চাই।
(সাইয়েদ ২০১৭: ৪০)

৩. কে বলেছে তুই সৃষ্টির সেরা? কোনো গরু? কোনো বাঘ? কোনো গাছ? তাইলে সে নিজে নিজে মাস্তানি।
(জুয়েল ২০১৪: ৩৫)

উদ্ধৃত কবিতাংশগুলোতে মানুষের একাধিপত্যকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনিভাবে, মানুষের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দেখা যে কোনো প্রতিমূর্তিও যে একপক্ষীয় ও খণ্ডিত, সেই বিষয়টিকেও সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এই একপাক্ষিক পর্যবেক্ষক মানুষ যে প্রকৃত অর্থে দখলদার, আধিপত্য-বিস্তারক এবং আত্মরতিগ্রস্ত—সেই ব্যঞ্জনাগুলোও উদ্ধৃত কবিতাংশগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে।

লোকপরম্পরায় চলমান একটি বিশিষ্ট ধারণাকেই সাধারণত 'জ্ঞান' বলে ভাবা হয়ে থাকে। মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং তার পাশাপাশি ক্রমবিকশিত মানুষের উপলব্ধি, ধারণা ও

অভিজ্ঞানকে যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে সুস্পষ্ট হবে যে, মানুষের কোনো উপলব্ধি, ধারণা বা অভিজ্ঞানই কোনো একটি স্থির বিন্দুতে কখনোই স্থির থাকেনি—বরং কালানুক্রমিকভাবে তার পরিবর্তন ঘটেছে। অঞ্চলভেদে মানববোধের এই পরিবর্তনশীলতার গতিধারা ও গতিপ্রকৃতিও সর্বদা এক রকম নয়। একটি কালে যা জ্ঞান বিবেচনা করা হতো, পরবর্তী কালে তাকে ভাবা হয়েছে সংস্কার, পরবর্তী অপর একটি কালে তা হয়তো কুসংস্কার বলেও স্বীকৃত হয়েছে।

সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এই বলে, 'জ্ঞান কাকে বলে? যাকে জ্ঞান বলে ভাবা হয় তা কি সত্য জ্ঞান? ভালোত্ব কাকে বলে?' (২০০৬: ৪৮)। মানুষ, মানবতাবাদ, মানুষের শ্রেষ্ঠতা এ সবই লোকপরম্পরায় চলমান একটি ধারণামাত্র—আধুনিকতাবাদীরা যাকে ধ্রব সত্য বলে শিরোধার্য জেনেছেন, কিন্তু বিনা প্রশ্নে, বিনা পরীক্ষায় উত্তরাধুনিকেরা তা মেনে নিতে রাজি নন। বস্তুত, একপাক্ষিক যে কোনো পর্যবেক্ষণ খণ্ডিত হতে বাধ্য। এমনও হতে পারে, ধ্রব সত্য বলে আদতে কোনো কিছুই নেই; দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত কোনো পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে ধ্রব সত্য বলে বিভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। মানুষ মহান, মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানবতাবাদ ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—এমন সব মহাবয়ান উত্তরাধুনিক কবিতায় খণ্ডন করা হয়েছে। উত্তরাধুনিকতাবাদীরা শিল্পে-সাহিত্যে তাই বিমানবিকীকরণের পক্ষপাতী। বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতায় বিমানবিকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি ঘটেছে মূলত 'প্রথাগত ভাষ্যের প্রতি বিরূপতা' (হুমায়ুন ২০০৫: ২৪) প্রকাশ করে। উত্তরাধুনিক পরিভাষায় একে বলা যায় matanatatives-এর fragmentation। ১, ২ ও ৩ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশগুলোয় যার প্রয়োগ লক্ষযোগ্য। প্রথাগত ভাষ্যে আস্থা রাখতে পারেননি বলেই ফ্রানৎস কাফকার (১৮৮৩-১৯২৪) কাছে মানবসভ্যতাকে মনে হয়েছে স্রেফ 'কুকুরীয় সভ্যতা' (২০১১: ৯)। আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) কথাটি বলেছেন আরো খোলাসা করে: 'হাতিয়ারই অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ করেছে, সে তথ্য আজ আর অস্বীকৃত নয়।' (২০০৬: ১০০)

দুই

মহাবয়ানের অন্তঃসারশূন্যতা, অলীকতা যখন উত্তরাধুনিক কবির কাছে উন্মোচিত, তখন কবিমনে একদা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের জগৎ একে একে ভেঙে পড়তে থাকে। সর্বব্যাপী অর্থশূন্যতা, আস্থাহীনতা, অবিশ্বাসের ভেতরে উত্তরাধুনিক কবির মনোজগৎ ক্রমাগত ঘুরপাক খায়, অতঃপর কবি গ্রস্ত ও নিমজ্জিত হন অতলস্পর্শী বিষাদগ্রস্ততায়। এই বিষাদগ্রস্ততা থেকে কবিমনে সৃষ্টি হয় সংক্ষোভ। আত্মবিরাগ ও ঈশ্বরবিশ্বাসে অনাস্থা এরই বিস্তারণ। উত্তরাধুনিক কবি বলেন:

৪. আমি বিশ্বাসকে ভয় পাই শেকলের চেয়েও বেশি।
কিন্তু মানুষকে দখলে নিয়েছে বিশ্বাস।
(জুননু ২০১৯: ১২)

৫. স্রষ্টা আমাদের ইনকোর্স পরীক্ষা নিচ্ছেন।
স্রষ্টানি খাতা কাটবেন পান খেতে খেতে তার নুরানি দাঁতের নিচে।

(মহিম ২০১৪: ৪১)

৬. আমি জায়নামাজে দাঁড়ালেই স্পষ্ট দেখতে পাই তোমার সদর-অন্দর।
(মাশরুর ২০২১: ৩০)

উদ্ধৃত চারটি কবিতাংশে সংশ্লিষ্ট কবিদের ঈশ্বর বিষয়ক যে ধারণা প্রকাশিত হতে দেখি, তাতে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ধর্মকথাকে কবিরা মহাবয়ান হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। শুধু তা-ই নয়, ঈশ্বরের অন্তর্প্রকৃতি এবং কর্মপরিধি নির্ণয়ীকরণে সংশ্লিষ্ট কবিদের সাংকেতিকতা ও পরিহাসপ্রবণতাও লক্ষণীয়। এসব কবিতায় প্রথাগতভাবে ও লোকপরাম্পরায় সঞ্চারিত বিশ্বাসকে যেমন কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, তেমনই এসব বিশ্বাসে অনড় জনগোষ্ঠিকে আঘাতও করা হয়েছে প্রবলভাবে। উদ্ধৃত ৪ সংখ্যক কবিতাংশে বিশ্বাসকে কবি রূপায়িত করেছেন শেকলের উপমান-কলায়। উদ্ধৃত ৫ সংখ্যক কবিতাংশে ঈশ্বরের চিত্রকল্প নির্মিতিতে কবিকে পরিহাসপ্রবণ হয়ে উঠতে দেখি: ঈশ্বর মানুষের 'ইনকোর্স পরীক্ষা' নিচ্ছেন, আর 'নুরানি দাঁতের নিচে' 'পান খেতে খেতে' 'স্রষ্টানি খাতা কাটবেন'। স্রষ্টা প্রসঙ্গে কবির পরিহাসপ্রবণতা 'স্রষ্টানি' প্রসঙ্গে এসে বিদ্রুপ রসে ঘনীভূত হয়েছে। ৬ সংখ্যক কবিতায় 'চিচিং ফাঁক' করার মতো করে কবিকে উন্মোচন করতে দেখি ঈশ্বরের গোপন রহস্যের প্রস্তরকঠিন দরজা। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার হুমকি তিনি অবশ্য দিয়েছেন বেশ নিম্নকণ্ঠে মোলায়েম পরিহাস রসেই, কিন্তু তা যে ধারালো, সুচালো এবং লক্ষ্যভেদী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) লক্ষ করেছেন, ধর্ম মানুষকে চিন্তাশীলতার দিক থেকে অন্ধ করে রাখে। *আমি কেন ধর্মবিশ্বাসী নই* গ্রন্থে রাসেল ধর্মের ক্ষতিকর দুটি দিক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, ধর্ম দুটি দিক থেকে মানুষের ক্ষতি করে। এর একটি হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ধর্ম যেসব বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বিনা প্রশ্নে দ্বিধাহীনভাবে সেগুলোকে বিশ্বাস করতে হয়। দ্বিতীয়টি হল, ধর্মে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার কোনো সুযোগ নেই। ধর্ম-নির্দেশিত সকল মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম-নির্দেশনা অবশ্য-কর্তব্য বলে পালন করা লাগে (রাসেল ২০০৬: চার)। বিশ্বাস, জ্ঞান ও বোধ পরস্পরের সঙ্গে যতটা সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি। ধর্ম যেখানে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, জ্ঞান সেখানে নির্দিষ্ট একটি কালের একটি মানপ্রজ্ঞা। স্থানিক এবং কালিক পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানও একটি স্থির চিন্তাশীলতা। জন বার্জার (১৯২৬-২০১৭) তাই সম্ভবত বলে থাকবেন, 'কোনো কিছুকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত' (২০১৫: ১৩)। এই দিক থেকে দেখতে গেলে বিশ্বাস ও জ্ঞানের তুলনায় বোধ ক্রমশ অগ্রগামী। বেগম আকতার কামালের (জ. ১৯৫২) মতে বোধ নিছক অনুভূতিলব্ধ কোনো প্রজ্ঞা নয়, অভিজ্ঞতার সারবত্তাও নয়— এর পরিধি আরো ব্যাপক। বোধের সঙ্গে সমন্বিত হয় জ্ঞান, যুক্তিশীলতা, অন্তর্দৃষ্টির শক্তিময়তা ইত্যাদি। তাঁর ভাষায়: 'বোধ অর্জনের পদ্ধতি সহজ বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তা মানবমস্তিষ্কের দুর্জ্ঞেয় অন্তর্লীন জটিলতা-তাড়িত অন্তহীন ক্রিয়া ও প্রকাশের যুগ্মক। একে প্রতিমুহূর্তে সক্রিয় রাখা ও অনুভব করাই হচ্ছে বোধ।' (২০০৭: ৫২)

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উত্তরাধুনিক কবিদের ঈশ্বরভাবনা বিশ্বাসে নিবদ্ধ নয়, তাঁদের ধর্মজ্ঞান আধুনিকতাবাদীদের মতো স্থানিক ও কালিকভাবে স্থিরও নয়; বরং এই বলা সমীচীন যে, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস উত্তরাধুনিক বোধ দ্বারা পরিগঠিত।

তিন

উত্তরাধুনিক কবিতায় প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা সর্বদা প্রচণ্ড, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে—বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করতে গিয়ে উত্তরাধুনিক কবিরা প্রথমে আঘাত করেছেন খোদ রাষ্ট্রযন্ত্রকেই। শ্বাসরুদ্ধকর একটি সময়ে এবং সমাজে বাস করতে হচ্ছে বলে কালের দাহ তাঁদের কবিতায় প্রবলভাবেই মুদ্রিত। উত্তরাধুনিক কবিকে প্রথাবদ্ধ, সমাজবদ্ধ জীবনে বসবাস করতে হচ্ছে—কথাটি সমগ্র সত্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ; সত্যের অপর বৃহদাংশ হচ্ছে এই, উত্তরাধুনিক কবি সমাজবদ্ধ, সংঘবদ্ধ গড়পড়তা অন্য দশ জন আমজনতার মতো নন। আধুনিক কবির মতো সমাজের দেখভাল করবার দায়িত্ব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজ স্কন্ধে তুলে না নিয়েও যথার্থ অর্থেই তিনি কর্তব্যপরায়ণ এবং সচেতন নাগরিক। এই সূত্রেই তাঁর মর্মন্তুদ অন্তর্দাহ। উত্তরাধুনিক কবির সংক্ষোভ, ঘৃণা সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে—রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র; সরকার ও রাজনীতি; ঘড়েল রাজনীতিবিদ হতে দালাল আমলা; ধর্মজীবী মৌলবাদী গোষ্ঠী; শ্লোগানসর্বস্ব উচ্চকিত মিছিল-কবি থেকে শুরু করে পাতি বুর্জোয়া মৃদুভাষী সুশীল কবি; অনুপ্রাসখচিত পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে নীতিকথা-ধর্মকথার ছবক দেওয়া ওয়াজিয়ান কবিতাওয়ালা থেকে শুরু করে কৈশোরক প্রেমকাতরতায় উদ্বেল বয়স্কবালক কবিযশোপ্রার্থী; ফরম্যাট দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—সবার বিরুদ্ধেই উত্তরাধুনিক কবির তীক্ষ্ণ তির নিক্ষিপ্ত হতে দেখি। যেমন:

৭. প্রতিদিন
একটি রাষ্ট্রীয়
কুকুর আমাকে
স্বপ্নঘোরে তাড়া
করে ফেরে!
(পলিয়ার ২০১৮: ১০)

৮. মৃত ব্যক্তিরা আমাদের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে
(রহমান ২০১৬: ২৭)

৯. রাষ্ট্রের বগলে কাতুকুতু দাও
(মঈন ২০১৭: ২৫)

১০. ... থানাটাকেই মনে হচ্ছে ধর্মশালা
পুলিশ আমাকে দেখেই বলল—এখানে খুনির জায়গা নেই
দয়া করে সংসদে যান।
(চন্দন ২০১০: ৮৫)

১১. ... বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুখ করে
মুতি আমি ...

...। আমি জানি, অধ্যাপকেরা
শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করা কলোনিয়াল খাটাশ।
(সাইয়েদ ২০১৬: ৯)

১২. ছি! এখানে কনডম ফেলবেন না;
এটা জাতিসংঘ।
পরিত্যক্ত টয়লেট ওপাশে।
(কাশেম ২০১০: ৮০)

১৩. ... গুরু ভক্তে প্রণিপাত শিক্ষা ঘোড়ায় দৌড়ায়
উদ্ভট সংশয়লিপ্ত অত্যন্ত গুরুর পুচ্ছে
মাঝে মাঝে অর্থহীন আগুন লাগাও।
(ব্রাত্য ২০০১: ৭২)

১৪. পুরো দেশ ডাস্টবিন খুঁজে
না পেয়ে অগত্যা
নিজের পকেটেই রাখলাম—
ঘৃণাস্পদ থু থু
(আবিদ ২০১৭: ১৯)

৭ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কুকুরের প্রতীকে রাষ্ট্রকে রূপায়িত হতে দেখি; যে কুকুর স্বপ্নের ভেতরেও কবিকে তাড়া করে ফেরে। জাগৃতির প্রহরে প্রহরে তো বটেই, ঘুমের সুষুপ্তিতে, এমনকি কবির স্বপ্নের জগতেও কুকুরের হামলা। ৮ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে বিরোধাভাস অলংকারের নিপুণ নির্মিতি তাৎপর্যপূর্ণ—গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে রাজতন্ত্র তথা পরিবারতন্ত্রের প্রবল প্রতিষ্ঠার দিকটিই এ অংশে আভাসিত হতে দেখি। ৯ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে রাষ্ট্রকে হাস্য-পরিহাস-বিদ্রুপের লক্ষ্যস্থল হিসেবেই রূপায়িত হতে দেখি, যার বগলে কাতুকুতু দিয়ে পরিহাস করা ছাড়া আর কোনো করণীয় আছে বলে কবি আদৌ মনে করেন না। ১০ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে থানা এবং সংসদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কবির বিদ্রুপ-পরায়ণতা তির্যক ভাষায় রূপায়িত হতে দেখি। কবি থানাকে যখন 'ধর্মশালা' হিসেবে নির্দেশ করেন, তখন পাঠক এর বিপ্রতীপ পাঠই গ্রহণ করে; কিন্তু সংসদ ভবনকে যখন খুনিদের যথোপযুক্ত স্থান বলে পুলিশের জবানিতে কবি আবার অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, তখন সে কথার বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ অনুধাবনে পাঠকের বেগ পেতে হয় না। ১১ সংখ্যক উদ্ধৃতিটি যে কবিতা থেকে গৃহীত, সেই কবিতায় শিক্ষক হিসেবে কবি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন যথাক্রমে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পিঁপড়া, ঘোড়া ও গাধার প্রতি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরকে শিক্ষক হিসেবে গণনার যোগ্য বলেও কবি বিবেচনা করেননি। তাঁর কবিতার শিরোনামটিই জানান দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তাঁর আস্থাহীনতা ঘৃণার কোন স্তরে উপনীত হয়েছে। ১২ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে কবিকে বীভৎস রসের সঞ্চারণ ঘটাতে দেখি। কবির নির্মিতিতে জাতিসংঘ পরিত্যক্ত টয়লেটের চেয়ে অধিকতর নোংরা জায়গা। ব্যবহৃত কনডম জাতিসংঘে নিক্ষেপ না করে সেগুলো পাশের পরিত্যক্ত টয়লেটে ফেলার জন্য জনগণকে কবি তাঁর কবিতায় উৎসাহিত করেছেন। ১৩ সংখ্যক উদ্ধৃতিটি যে কবিতা থেকে সংকলিত সে কবিতায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণির স্বরূপ উন্মোচনে কবি পরিহাস-তরল ও বিদ্রুপ-পরায়ণ। নিরাপদ দূরত্বে

থেকে বিবৃতিদানই তাঁদের দৃশ্যমান কর্ম। কবির রূপায়ণে জ্ঞানজীবী হিসেবেই তাঁরা চিত্রিত হয়েছেন। সদাসর্বদা তাঁরা যেসব জ্ঞান বিতরণ করে বেড়ান, সেগুলোও যে তাঁদের মৌলিক উপলব্ধিজাত নয়—তাও ফাঁস করে দিতে কবি বিস্মৃত হন না। উপরন্তু, এ জাতীয় বুদ্ধিজীবী 'গুরু'দের প্রতি প্রণিপাত না করে বরং তাঁদের লেজে অগ্নিসংযোগ করার জন্য সবাইকে কবি অনুপ্রাণিত করেন। ১৪ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে কবির ঘৃণা অবদমনে সংক্রামিত হতে দেখি। প্রতিকূল সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে কবিমনে বিবমিষা জাগে; অতঃপর তা থেকে কবিমুখে উৎপন্ন হয় ঘৃণাস্পদ একরাশ থু থু। থু থু ফেলার জন্য কবি দেশময় ডাস্টবিন খুঁজে বেড়ান কিন্তু কোথাও তা পান না। অতঃপর দেখলাম, কবি তাঁর থু থু নিজের পকেটেই রেখে দিলেন। নীরব ঘৃণার প্রকাশ যে কতটা তীব্র ও তির্যক হতে পারে তার রূপায়ণ হিসেবে কবিতাটি অনন্য।

চার

বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতায় ঈশ্বরবিশ্বাস, ধর্ম, মানবকেন্দ্রিকতা তথা মানবতাবাদ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র, বৈশ্বিক রাষ্ট্রসংঘ যেমন পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে, তেমনিভাবে জ্ঞান তথা প্রথাবদ্ধ মানুষের চিন্তাশীলতা, জন-ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি, দর্শন ও নৈতিকতা—বলা যায়, চিন্তাশীলতার জগতে আপাতভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল ধারণাকেই নতুন করে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

১৫. মানুষের মস্তিষ্ক খুঁড়ে দেখেছি
গোরস্থান ছাড়া আর কিছু নাই।
(ইমতিয়াজ ২০২০: ৫৩)

১৬. একে একে নর্থ ও সাউথের চৌহদ্দির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে বিদ্বৎসমাজ
(মামুন ২০২১: ৬)

১৭. সত্য হল একটি শূন্যস্থান
যেখান থেকে
রূপকথারা
বাতাসে মিশে
ছড়িয়ে দেয় অশান্তির বীজ
(শিশির ২০১৩: ১৪)

১৮. ইতিহাস থেকে খুঁজে নিতে হবে বিশ্বাসের হালুয়া
(শামীম ২০২০: ৫৯)

১৯. পুরাণের কথা বলব না। বাম পাঁজর থেকে খসে যাওয়া
হাড্ডির গল্প নিয়ে আসর বসানো
আজকের এজেন্ডা নয়।
(রহমান ২০১৬: ৭০)

২০. কলাভবনে আটকে আছে নীতিবিদ্যার পা
(আহমেদ ২০১৩: ৩২)

আধুনিকতাবাদীদের তাবৎ চিন্তাশীলতাকে উত্তরাধুনিক কবিরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন, প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন—পুনর্বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন না করে মহাবয়ানের কোনো পাঠই বিনা প্রশ্নে তাঁরা গ্রহণ করেননি। ১৫ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে কবি মানবমস্তিষ্ককে গোরস্থানের প্রতীকে রূপায়িত করে প্রকারান্তরে চিন্তাশীলতার সমগ্র অর্জনকেই তিনি খারিজ করে দেন। গোরস্থানে যেমন শায়িত আছে একদা জীবিত মানুষের দেহাবশেষ, মানব-মস্তিষ্কেও তেমনই প্রোথিত রয়েছে একদা দাপুটে জ্ঞান ও চিন্তা, যা আজ মৃতদেহের মতোই পরিত্যক্ত। আধুনিকতাবাদীরা একদা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলত, এটিও যে কার্যত মহাবয়ানের মিথ্যা গল্প, সেটি নিরূপিত হতে দেখি উদ্ধৃত ১৬ সংখ্যক কবিতাংশে, যেখানে উত্তরাধুনিক কবি দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, জ্ঞানের জগতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই; উপরন্তু তিনি জ্ঞানজগতে পুব ও পশ্চিমের প্রবল মেরুকরণ প্রত্যক্ষ করেন, যে দুটি কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাবৎ বিদ্বৎসমাজ। ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা অনস্তিত্বশীল, সমষ্টিবদ্ধ চিন্তাশীলতাও মেরুকরণগ্রস্ত এমন একটি ভয়াবহ বার্তা এ কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ধৃত ১৭ সংখ্যক কবিতাংশে 'সত্য' বলে কথিত মহাবয়ানকে খণ্ডন করতে দেখি। উত্তরাধুনিক এই কবির নির্মিতিতে সত্য শূন্যতার অলীক একটি ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্য স্রেফ একটি মতাদর্শ, যার আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে, উদ্দীপনায়-উন্মাদনায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠির ভেতরে গালগল্প ঘনীভূত হয়; অতঃপর তা থেকেই সূত্রপাত ঘটে যাবতীয় সংঘাতময় পরিস্থিতির। যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থান ও বিকাশের বৃত্তান্ত কবি হয়তো সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করে থাকতে পারেন তাঁর এ কবিতায়। অতীতকালে ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছিল; এবং কালিক পরিক্রমায় দেশে দেশে তার স্থানীয়করণের ইতিহাসও আমরা জানি। নিজ নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে এবং আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষে এসব জাতীয়তাবাদী শক্তি পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী শক্তির পেছনে প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে নিজেদের প্রণীত মতাদর্শগত কিছু বিশ্বাস। এসব প্রণীত বিশ্বাসের অন্তর্দেশ উন্মোচনে উত্তরাধুনিক কবিরা সবসময়ই সক্রিয় থেকেছেন। ১৮ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশে তথাকথিত সেই বিশ্বাসগুচ্ছকে 'হালুয়া' প্রতীকে রূপায়িত করেছেন বিদ্রুপ-পরায়ণ কবি। উদ্ধৃত ১৯ সংখ্যক কবিতাংশে কবি যে সমাজ ও সংস্কৃতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, সেই সমাজ ও সংস্কৃতিও লোকপরম্পরায় প্রবহমান, পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধর্মবিশ্বাসের ওপরে স্থাপিত। বাম পাঁজরের হাড় থেকে নারীর সৃজন উত্তরাধুনিক কবির মূল্যায়নে পৌরাণিক গালগল্প বলেই পরিগণিত হতে দেখি। ধর্মকে পৌরাণিক উপকথার চেয়ে অধিক কিছু ভাবতে কবিকে এখানে দেখা যায় না। 'হাড্ডির গল্প নিয়ে আসর বসানো আজকের এজেন্ডা নয়' বলে কবি তাঁর এ কবিতায় ধর্মবিষয়ক ম্যাটান্যারেটিভসকে মেয়াদোত্তীর্ণ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়েও দিয়েছেন। উত্তরাধুনিক কবির রূপায়ণে দর্শন ও নৈতিকতাও কৃত্রিম বুলিসর্বস্ব পঙ্‌ক্তিমালা মাত্র—সমাজজীবনে যার প্রয়োগ লক্ষযোগ্য নয়। উদ্ধৃত ২০ সংখ্যক কবিতাংশে কবি প্রত্যক্ষ করেন, কলাভবনে নীতিবিদ্যার পা আটকে আছে—যাপিত জীবনে কিংবা সমাজে তার কোনো পদচারণা নেই।

মানুষের চিন্তাশীলতার সারবত্তা নিয়ে উত্তরাধুনিক কবিতায় বারবার জোরালোভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখি। আধুনিকতাবাদীদের জ্ঞান—আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে—

আধুনিকতাবাদীদের চিন্তাশীলতা, জন-ইতিহাসের গঠনপ্রক্রিয়া, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ ও রীতি, দর্শন ও নৈতিকতার প্রয়োগিকতা নিয়ে উত্তরাধুনিক কবিতায় এমন কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যেগুলোকে অমূলক বলে এককথায় খারিজ করে দেওয়া অসম্ভব। 'মানুষের মুক্তি কী বস্তু এবং তা কোন পথে পাওয়া যায়? এই চিন্তার ইতিহাস খোদ পৃথিবীর ছায়ার মতোই দীর্ঘ' (সলিমুল্লাহ ২০১০: ২৯৩)। *দার্শনিক সমস্যা* গ্রন্থে আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৪৩) দার্শনিক কার্নপের (১৮৯১-১৯৭০) মন্তব্য উদ্ধৃত করে দর্শনশাস্ত্রের অসারতা ও অকার্যকরতার প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। কার্নপ সেখানে বলেন, 'নৈতিক বাক্য কখনো এমন কিছু প্রকাশ করে না, যা প্রায়োগিকভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে বিবেচিত হতে পারে। ফলে এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন' (২০০০: ৩৫৩)। জা পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) লক্ষ করেছেন, 'উচ্চমার্গ দর্শনের বিরবচ্ছিন্ন আবর্তে ব্যক্তিত্ব যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন ধর্ম, সমাজ, ঈশ্বর সব মেকি হয়ে যায়।' (২০০৬: ৫)

পাঁচ

বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতায় বিপন্ন অনুভবের রূপায়ণ ঘটতে দেখি। সমাজে বাস করেও উত্তরাধুনিক কবি যেন একটি বহিরস্থিত সত্তা। কোনো কিছুর সঙ্গেই তিনি একাত্ম হতে পারেন না। ভৌগোলিকভাবে যে সমাজে তিনি বাস করেন, মনোজাগতিকভাবে সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট নন। গড্ডলিকাপ্রবাহে আর দশ জনের মতো তিনি গা ভাসিয়ে দিতে পারেন না। যে রাষ্ট্রে তাঁর বাস, সেটি শ্বাসরূদ্ধকর একটি ভৌগোলিক পরিসীমা ছাড়া আর কিছু নয়। যে পরিবারের তিনি সদস্য, সেই পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দূরবর্তী নতুবা ক্ষয়িষ্ণু। প্রেমে বিশ্বাস, শ্রদ্ধাশীলতা, বিশ্বস্ততা, দায়িত্বশীলতা—সবগুলো সূচকেই তাঁর কমতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রেম মনোদৈহিক বলে সে প্রেম ভঙ্গুর এবং ক্রমশ অপস্রিয়মাণ। উত্তরাধুনিক কবিতায় প্রেমে সুখহীনতা, দাম্পত্যে শান্তিহীনতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত। কোথাও কবি স্বস্তি পান না—না মিলনে, না বিরহে, না বিচ্ছেদে। মানবিক সম্পর্কের সবগুলো বৃত্তে নিরন্তর টানাপোড়েন, ক্লেদ, নঞর্থকতা উত্তরাধুনিক প্রেমের কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য। প্রাসঙ্গিক কিছু পাঠ উদ্ধৃত করছি:

২১. প্রেম মানে বৃষ্টি
কয়েকদিন একটানা লেগে থাকলেই
মন খোঁজে ঝরঝরে রোদের মাঠ।
(বাবুল ২০১৯: ১৬)

২২. ফাইনালি, প্রেম হচ্ছে ছুটা বুয়া
(টোকন ২০১০: ৫৫)

২৩. বলি—প্রেম শাশ্বত নয়
প্রেম হলো কয়েক হাজার বছরের জনপ্রিয় ফ্যান্টাসি, বিভ্রম
হরমোনাল বিক্রিয়া,
প্রাকৃতিক ষড়যন্ত্র।
(জয় ২০২০: ৭৪)

২৪. প্রিয়তমা বলে ডাক দিই

বেরিয়ে আসে দেহ
আমি তো তোমারে ডাকিনি
তাই? বলে দেহ
আমি তোমারই ডাকিনী
(সরকার ২০১৬: ২৯)

২৫. আমি যেখানে
পা
রাখি
সেখানেই
তৈরি হয়ে যায় কবর।
(ইমতিয়াজ ২০২০: ১৭)

আধুনিকতাবাদীদের মহাবয়ানে প্রেম পূর্বাপর মহিমারঞ্জিত—প্রেম স্বর্গীয়, প্রেম শাশ্বত, প্রেম অবিনশ্বর হেন তেন আরো কত কী! প্রেম সম্পর্কিত এসব মহাবয়ানগুলোকে উত্তরাধুনিক কবিতায় খারিজ করে দিতে দেখি। প্রেমে একনিষ্ঠতার ধারণাটি যে অলীক, উদ্ধৃত ২১ সংখ্যক কবিতাংশে তা বেশ জোরালোভাবে দাবি করা হয়েছে। উত্তরাধুনিক কবির রূপায়ণে প্রেম হচ্ছে বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক একটি ব্যাপার—যে বৃষ্টি স্নিগ্ধতাসঞ্চারী, সেই বৃষ্টিই একটানা কয়েকদিন লেগে থাকলে রীতিমতো বিরক্তিকর, অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন সংগত কারণেই 'মন খোঁজে ঝরঝরে রোদের মাঠ'। কবি বলতে চাইলেন, হ্রস্বমেয়াদি প্রেম সন্দেহাতীতভাবে আনন্দময় ও উপভোগ্য, কিন্তু প্রেম দীর্ঘমেয়াদি হয়ে উঠলে তা বিরক্তি উৎপাদন করে। উদ্ধৃত ২২ সংখ্যক কবিতাংশেও প্রেমে বহুনিষ্ঠার সাক্ষ্য আছে। এই কবিতায় প্রেমকে 'ছুটা বুয়া'র মতো খণ্ডকালীন, ভ্রাম্যমাণ, অস্থায়ী, সঞ্চরণশীল একটি অস্তিত্ব হিসেবে রূপায়িত হতে দেখি। প্রাক্-বিশ্লেষিত কবিতায় প্রেমকে রূপায়িত হতে দেখেছিলাম বৃষ্টির রূপকল্পে, এই কবিতায় প্রেমকে রূপায়িত হতে দেখছি বুয়ার প্রতীকে। ২৩ সংখ্যক উদ্ধৃত কবিতাংশের শুরুতেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবিকে ঘোষণা করতে শুনি 'প্রেম শাশ্বত নয়' বলে। প্রেম তাহলে কী, সেটি খোলাসা করার অভিপ্রায়ে কবিকে এরপর উপর্যুপরি চারটি প্রতীক নির্মাণে মনস্ক হতে দেখি—'ফ্যান্টাসি', 'বিভ্রম', 'হরমোনাল বিক্রিয়া' এবং 'প্রাকৃতিক ষড়যন্ত্র'। প্রেম যে দেহাতীত কোনো ব্যাপার নয়, সর্ব অর্থেই সেটি যে আসলে একটি দেহজ ব্যাপার, সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি উদ্ধৃত ২৪ সংখ্যক কবিতাংশে। প্রেমের কাছে ইন্দ্রিয়াতীত মাধুর্য কবি প্রত্যাশা করেছিলেন। হৃদয়কেই ডাকেন কবি, অথচ তাঁর ডাকে দেহই কেবল সাড়া দেয়। কবি রবীন্দ্রনাথ-কথিত গহন-স্বপন-সঞ্চারিণী দেবীকে আহ্বান করেন, অথচ হাজির হয় রক্তচোষা ডাইনি—'ডাকিনী'। প্রেমোপলব্ধির ক্ষেত্রে আধুনিক কবির সঙ্গে উত্তরাধুনিক কবির এই ফারাক দুস্তর। কেবল প্রেম নয়, দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, সব ধরনের মানবিক সম্পর্কই যে শেষ পর্যন্ত ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমহ্রাসমান, তা ঘোষিত হতে শুনি ২৫ সংখ্যা-খচিত উদ্ধৃত কবিতাংশে। কবি এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাফ জানাচ্ছেন, যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই তৈরি হয়ে যায় একেকটি কবর।

A season in Hell গ্রন্থে আর্তুর র‍্যাঁবোকে (১৮৫৪-১৮৯১) ক্ষোভোক্তি করতে শুনি 'শালার বিয়া' (২০১০: ৩৩) বলে। বৈবাহিক জীবনকে তিনি নরকবাসের সাথে একীকরণ করে রূপায়ণ করেছেন। হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) তাঁর *নারী* গ্রন্থে অনুমানসিদ্ধ মন্তব্য করে

বলেছেন, 'প্রথাগত বিয়ে একদিন এখানেও হয়ে উঠবে অতীতের ব্যাপার' (২০১৮: ২৪৬)। কোনো কালখণ্ডে অসংখ্য কবির ভেতরে 'প্রধান কবি' এবং 'উৎকৃষ্টতম কবি' বিবেচনা করা হয় তাঁকেই, যিনি নতুন সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম, যিনি 'অধিকার করেন জীবন ও অভিজ্ঞতার এমন এলাকা, যা তাঁর আগে অধিকারে আসেনি অন্য কারো।' (হুমায়ুন ২০০৮: ৩০)

উত্তরাধুনিকতাবাদীদের প্রধান দাবি এই, ভাষায় লিপিবদ্ধ সমস্তই 'মানুষের নির্মাণ, বানানো'—তাই মানুষের সব কথাই ব্যক্তিক, সামাজিক, দেশিক, কালিক পটভূমিতে নিজ নিজ অনুভব ও অভিজ্ঞতার বয়ানমাত্র। এমন কোনো বয়ান নেই যা জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে নির্ভুল, পরিপূর্ণ বা নিদেনপক্ষে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার সক্ষমতা রাখে (ফরহাদ ২০১৯: ১৩১)। আধুনিকতাবাদীদের মহাবয়ান হিসেবে পরিচিত মেকি, পরিত্যক্ত চিন্তাকে প্রতিচিন্তা দ্বারা খণ্ডন ও খারিজ করার সাথে হাত ধরাধরি করে চলতে চলতে এভাবেই বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

জীবনজিজ্ঞাসার পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের রূপ ও রীতির পরিবর্তন একটি অনিবার্য পরম্পরা। উনিশ শতকের শুরুতে আধুনিকতাবাদীদের চিন্তাশীলতার সঙ্গে বাংলা কবিতার বিষয় এবং প্রকরণগত পরিবর্তন ঘটতে দেখেছি। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে—আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে—একুশ শতকের শুরু থেকে বাংলা কবিতার আরেকটি বাঁকবদল যে সূচিত হতে দেখছি, তার পেছনে সক্রিয় রয়েছে উত্তরাধুনিকতাবাদী চিন্তাশীলতার অভিঘাত। বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিক চিন্তাশীলতার যে অভিযাত্রা শুরু, ষাটের দশকে যার উত্তুঙ্গ অবস্থানে আরোহণ, নব্বইয়ের দশক থেকে সেই আধুনিক চিন্তাশীলতাকেই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেখছি; এবং একুশ শতকের শুরু থেকে আধুনিকতাবাদী সেই চিন্তাশীলতাকে স্রেফ খারিজ করে দেওয়ার একটি প্রবণতা যে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে, বাংলাদেশের উত্তরাধুনিক কবিতাপাঠে তা প্রতিভাত হবে।

সহায়কপঞ্জি

আবিদ ফয়সাল (২০১৭)। *মানুষ হবার আগে গ্রামে যেতে হয়*। সিলেট: নাগরী

আর্তুর র‍্যাঁবো (২০১০)। *দোযখে এক মরশুম* (হোসেন মোজাম্মেল অনূদিত)। ঢাকা: সন্দেশ

আহমদ শরীফ (২০০৬)। *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আহমেদ স্বপন মাহমুদ (২০১৩)। *ভূখণ্ডে কেঁপে ওঠে মৃত ঘোড়ার কেশর*। ঢাকা: শুদ্ধস্বর

ইমতিয়াজ মাহমুদ (২০২০)। *কালো কৌতুক*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ

ইমতিয়াজ মাহমুদ (২০২০)। *গন্ধমফুল*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ

কার্নপ (২০০০)। *দার্শনিক সমস্যা*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন

কাশেম নবী (২০১০)। *শূন্যের করতালি* (তালাশ তালুকদার সম্পাদিত)। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশনা

চন্দন চৌধুরী (২০১০)। *শূন্যের করতালি* (তালাশ তালুকদার সম্পাদিত)। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশনা

জন বার্জার (২০১৫)। *ওয়েজ অব সিইং* (আসমা সুলতানা ও কাজী মাহবুব হাসান অনূদিত)। ঢাকা: অনার্য পাবলিকেশন্স লি.

জয় জাহাজী (২০২০)। *নাভীর নিকটে সেমেট্রি*। চট্টগ্রাম: চন্দ্রবিন্দু
জা পল সার্ত্র (২০০৬)। *যখন সুমতি*। ঢাকা: আনন্দধারা
জুননু রাইন (২০১৯)। *এয়া*। ঢাকা: ঐতিহ্য
জুয়েল মোস্তাফিজ (২০১৪)। *দুধের পুকুরে ভাসছে কফিন*। ঢাকা: ঐতিহ্য
টোকন ঠাকুর (২০১০)। *টোকন ঠাকুরের কবিতা*। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ
পলিয়ার ওয়াহিদ (২০১৮)। *সময়গুলো ঘুমন্ত সিংহের*। ঢাকা: অগ্রদূত
ফরহাদ মজহার (২০১৯)। *মার্কস, ফুকো ও রুহানিয়াত*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী
ফ্রানৎস কাফকা (২০১১)। *বিচার*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং
বাবুল আক্তার (২০১৯)। *সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ*। চট্টগ্রাম: চন্দ্রবিন্দু
বারট্রান্ড রাসেল (২০০৬)। *আমি কেন ধর্মবিশ্বাসী নই* (শামীম আহমেদ অনূদিত)। ঢাকা: শব্দগুচ্ছ
বেগম আকতার কামাল (২০০৭)। *কবির উপন্যাস*। ঢাকা: ঐতিহ্য
ব্রাত্য রাইসু (২০০১)। *আকাশে কালিদাসের লগে মেঘ দেখতেছি*। ঢাকা: দ প্রকাশনা
মঈন মুনতাসীর (২০১৭)। *শিশমহল*। সিলেট: চৈতন্য
মহিম সন্ন্যাসী (২০১৪)। *ভাঙা শামুকের বয়ঃসন্ধি*। ঢাকা: অর্বাক
মামুন অর রশীদ (২০২০)। *উত্তর-আধুনিকতা*। ঢাকা: সংবেদ
মামুন রশীদ (২০২১)। *যা কিছু লিখেছি সব সব প্রেমের কবিতা*। ঢাকা: লেখমালা
মাশরুর মাজিদ (২০২১)। *নীতিবিদ্যা-বিষয়ক*। ঢাকা: বেহুলা বাংলা
রহমান হেনরী (২০১৬)। *শতরথগুঞ্জন*। ঢাকা: কাা বুকস
শামীম রফিক (২০২০)। *ভিলানেল এক বিষণ্ন সময়ের গান*। দিনাজপুর: কবিমানস
শিশির আজম (২০১৩)। *রাস্তার জোনাকি*। ঢাকা: সাম্প্রতিক
সরকার আমিন (২০১৬)। *ইস্ত্রি করা জীবন আমার ভাল্লাগে না*। সিলেট: চৈতন্য
সলিমুল্লাহ খান (২০১০)। *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী
সাইয়েদ জামিল (২০১৬)। *নিয়ম না মানা মাস্টার*। সিলেট: চৈতন্য
সাইয়েদ জামিল (২০১৭)। *ইবনে সিনার হৃৎপিণ্ড*। সিলেট: চৈতন্য
হাসান আজিজুল হক (২০০৬)। *সক্রেটিস* (অনূদিত)। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন
হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী
হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী
হুমায়ুন আজাদ (২০১৮)। *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী